17th and 18th Century Non-Fictional Prose

Course Code : 231105

Francis Bacon

Born 1561, Strand, London, England

Died 1626, Highgate, Middlesex, England

Occupation Philosopher, Statesman, Scientist, Jurist, Orator and Author

Nationality English

Period Renaissance

জীবন ও সাহিত্যকর্ম

ফ্রান্সিস বেকনের জন্ম ১৫৬১ সালের জানুয়ারি মাসে লন্ডনে। অভিজাত পরিবারের সন্তান, পিতা স্যার নিকোলাস বেকন ছিলেন 'লর্ড কিপার অব দ্য গ্রেট সিল', আর মাতা স্যার অ্যান্থনি কুকের কন্যা। তাঁর শৈশব সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না। যেটুকু জানা যায়, তাতে তিনি ছিলেন লাজুক প্রকৃতির আর প্রায় সময়ই নানা রোগবালাইয়ে জর্জরিত ক্ষীণস্বাস্থ্য এক বালক। তাঁর গাম্ভীর্য এই অসুস্থতারই ফল বলে মনে করা হয়। তবে তিনি পড়তে ভালোবাসতেন।

১৩ বছর বয়সে তাঁর বড় ভাইয়ের সাথে তাঁকে ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হয়। তিন বছর সেখানে পড়াশুনো করার পর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে এক তীব্র বিরাগ নিয়ে তিনি ওই প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেন।

শৈশব থেকেই নগরজীবনের কেতাদুরস্ত আচার-আচরণের সাথে তাঁর সখ্য গড়ে উঠেছিল। আর তা মোটেও অসঙ্গত ছিল না, কারণ পিতার উচ্চপদমর্যাদা ও প্রভাবশালী পারিবারিক বলয়ের মাঝে বসবাস করার কারণে তাদের বাড়িতে রানী এলিজাবেথসহ আরো অনেক বিখ্যাত লোকের যাতায়াত ছিল। তাদের হার্টফোর্ডশায়ারের বাড়িতে রানী এলিজাবেথ একাধিকবার বেড়াতে গেছেন। একবার রানী তাঁর এই গাম্ভীর্য দেখে ঠাট্টা করে তাঁকে 'her young lord keeper' হিসেবে সম্বোধন করেছিলেন। শৈশব থেকেই রাজকীয় আচার-আচরণের সাথে পরিচয় ঘটার ফলে বিভিন্ন লেখনীতে তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। Of Ceremonies and Respects কিংবা Of Honour and Reputation প্রবন্ধে একজন উচ্চপদমর্যাদার মানুষের তার উর্ধ্বতন, অধস্তন ও সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সাথে কেমন আচরণ করা উচিত সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত ও সুবিবেচনাপ্রসূত মতামত ব্যক্ত করেছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কোনো দাসসুলভ আচরণ নয়, বরং তা কর্তব্যের অংশ। জ্যেষ্ঠদের সম্মান না করলে কনিষ্ঠদের কাছ থেকে আমরা কীভাবে সম্মান প্রত্যাশা করতে পারি? প্রশ্ন রেখেছেন তিনি।

১৫৭৬ সালের ২৭ জুন ফ্রান্সিস ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গ্রে'স ইন-এ আইনশিক্ষা লাভ করার জন্য ভর্তি হন। কিন্তু কয়েক মাস পর তিনি ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সাথে ফ্রান্সে চলে যান হাতেকলমে কূটনীতির প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে। রাজনীতি ও কূটনীতি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে 'Notes on the State of Europe গ্রন্থে। ফ্রান্স তখন ছিল একটি বিশৃঙ্খল রাষ্ট্র। ক্যাথলিক ও ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট (হিউগুয়েনট)দের মাঝে তখন চরম বিরোধ চলছিল। অজস্র নির্মম ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন প্রবন্ধ Of Faction। ফ্রান্সে অবস্থান করার ফলে তিনি ফরাসি ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।

১৫৭৯ সালে পিতার মৃত্যুর পর বেকন ইংল্যান্ডে ফিরে এসে নতুন করে ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে মনোযোগী হন। ১৫৮২ সালে আইন পেশায় যোগ দেন। কিন্তু ব্যবসায় সুবিধা করতে না পেরে ১৫৮৪ সালে ম্যালকম্বি রেজিস-এর প্রতিনিধিরূপে সংসদে প্রবেশ করেন। ১৫৮৪-৮৫ সালের শীতে তিনি রানী এলিজাবেথকে একটি পত্র লেখেন যা তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টির স্বাক্ষর বহন করে। শুধু পিউরিটানদের বেলায় নয়, ক্যাথলিকদের ক্ষেত্রেও নমনীয় হওয়ার ব্যাপারে তিনি রানীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

১৫৯১ সালে বেকন 'আর্ল অব এসেক্স'-এর সাথে যুক্ত হন যিনি তখন রানীর সুনজরে ছিলেন। এসেক্সের গোপন পরামর্শকদের একজন হওয়ার পর ১৫৯৩ সালে তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অ্যান্টনিকে এসেক্সের চাকরিতে নিয়োজিত করেন। ওই বছরই তিনি মিডলসেক্স-এর হয়ে পার্লামেন্টে বসেন কিন্তু স্পেনের যুদ্ধের খরচ মেটানোর জন্য সরকারের তিন গুণ ভর্তুকির দাবির বিরোধিতা করে তিনি রানীর বিরাগভাজন হন এবং নিজের ভবিষ্যৎকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন। ১৫৯৪ সালে যখন অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ শূন্য হয়, আর্ল অব এসেক্সের জোর সুপারিশ সত্ত্বেও রানী তাঁকে সে পদে না বসিয়ে স্যার এডওয়ার্ড কুককে মনোনয়ন দেন। পরের বছর সলিসিটর জেনারেল লর্ড বার্গলে এসেক্সে যোগদান করলে তাঁর শূন্যপদে বেকনকে নিয়োগের সুপারিশ করেন। কিন্তু এবারও রানী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি তাঁকে তাঁর বিজ্ঞ পরামর্শকদের একজনরূপে নিয়োগ দেন।

এসেক্স আবার বেকনকে 'Master of the Rolls' পদে নিয়োগের জন্য রানীর কাছে সুপারিশ পেশ করেন, কিন্তু এবারও রানী সে সুপারিশ প্রত্যাখ্যান করেন। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেকন উপলব্ধি করলেন যে, আর্ল অব এসেক্স অত্যন্ত কঠোর ও অনমনীয় মানসিকতার মানুষ। তাঁর কোনো পরামর্শ বা প্রস্তাবনা প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত হন। এমন মানুষ সম্পর্কে রানী সম্ভবত আতঙ্কিত আর তাই তাঁর সুপারিশের মানুষের ওপরও তিনি হয়ত ঠিক ভরসা করতে পারছিলেন না। বেকন তাই আর্ল অব এসেক্সকে তাঁর হয়ে রানীর কাছে সুপারিশ না করতে পত্র লিখলেন। জানালেন যে, তিনি নিজেই রানীর অনুগ্রহ লাভের প্রচেষ্টা চালাবেন।

১৫৯৯ সালে আর্ল অব এসেক্স টাইরন বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থ হয়ে রানীর কোপানলে পড়েন। তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে বেকন রানীর রাগ প্রশমনে কিঞ্চিৎ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেন। ১৬০০ সালের জুনে প্রিভি কাউন্সিলে অনানুষ্ঠানিক বিচারকার্যে বেকন তাঁর পৃষ্ঠপোষকের বিরুদ্ধে, খুব জোরালোভাবে না হলেও, অভিযোগ করেন। এ কারণে এসেক্স তাঁর প্রতি বিরূপ হননি, বরং মুক্তির পর আবার তাঁরা সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু অল্প কিছুকাল পরে এসেক্স একটি উদ্ভট কাণ্ড করে বসলেন। তিনি রানীর বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহে উস্কানি দিতে লাগলেন, আর এই অপরাধে এসেক্সকে গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করা হল এবং বিস্ময়কর হলেও সত্য, এবার বেকন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করলেন। তাঁর ভূমিকার কারণেই এসেক্স রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত হলেন এবং বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল। এতকিছুর পরও তিনি রানীর অনুগ্রহ লাভে ব্যর্থ হলেন।

যে হাত তাঁর অন্ন জুগিয়েছে, পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে সেই হাতই কেটে ফেলায় বেকন এক ধরনের অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করলেন। তা থেকে নিষ্কৃতি পেতে ১৬০৪ সালে তিনি Apology প্রকাশ করলেন।

১৬০৩ সালে প্রথম জেমস ক্ষমতায় আরোহণ করলে বেকন তাঁর সুনজর ও কৃপাদৃষ্টি লাভের প্রাণপণ চেষ্টা চালান এবং বরার্ট সেসিলের সহযোগিতায় 'নাইটহুড' উপাধি লাভ করেন। ১৬০৪ সালে তিনি অভিজ্ঞ পরামর্শকের স্বীকৃতি লাভ করার সাথে সাথে ইপসুইচ-এর সদস্য হিসেবে সংসদে বসেন এবং প্রথম অধিবেশনের বিতর্কে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

১৬০৫ সালে বেকনের Advancement of Learning প্রকাশিত হলে যথেষ্ট সাড়া পড়ে যায়। গ্রন্থটি রাজাকে উৎসর্গ করা হয়। পরবর্তীতে রচনাটি ফরাসি ভাষায় অনূদিত হয়। এর পরের বছর ১৬০৬ সালে ৪৫ বছর বয়সে বেকন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর স্ত্রী এলিস বার্নহাস ছিলেন লন্ডনের এক অলডারম্যানের কন্যা। তিনি সাথে করে পর্যাপ্ত যৌতুক এনেছিলেন যা বেকনের মতো ঋণগ্রস্ত একজন ব্যক্তির খুব কাজে এসেছিল। ব্যাপক ধূমধাম ও জাঁকজমকের সাথে তাদের বিয়ে হয়েছিল এবং পরবর্তী ১৫ বছর তারা সুখে-শান্তিতে কাটিয়েছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ একটা ভুলবোঝাবুঝি তাদের দুজনার মাঝে বিরাট দূরত্ব তৈরি করল যা আর কোনো দিন ঘোচেনি।

১৬০৭ সালের জুনে বেকন সলিসিটর-জেনারেলের পদ লাভ করেন। পরবর্তী তিন বছর তিনি দেশের বৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দল অ্যাংলিকান ও পিউরিটানদের মাঝে মতপার্থক্য নিরসনে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উভয় দল এমনকি রাজাকেও সহিষ্ণু হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৬০৮ সালে তিনি স্তুতিভাষণ In Felicicen Memoriam Elizabethan রচনা করেন। ১৬০৯ সালে প্রকাশিত হয় Wisdom of the Ancients যে গ্রন্থে কালজয়ী উপকথা ও রূপক গল্পের ব্যাখ্যা সংযুক্ত ছিল। ১৬০৭ ও ১৬১২ সালে তঁর প্রবন্ধের নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

১৬১২ সালে আর্ল অব স্যালিসবুরি রবার্ট সেসিল পরলোকগমন করলে বেকন ওই পদে নিয়োগ লাভের প্রচেষ্টা চালান, কিন্তু রাজার সম্মতি পেলেন না। কিন্তু পরের বছর রাজা তাকে তাঁর কহুকাঙ্ক্ষিত অ্যাটর্নি জেনারেলের পদে বসালেন। Of Great Place-এ তাঁর পদে থাকাকালীন বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, কিন্তু বেকনকে এই সুবিধা দেওয়ার পরও রাজা তাঁকে তেমন একটা পাত্তা দিতেন না। তাঁকে রবার্ট কার ও হাওয়ার্ডরা ঘিরে রাখতেন সারাক্ষণ। তাঁর পরামর্শও রাজা গ্রহণ করতেন না। ১৬১৪ সালের সংসদে বেকন ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন। সেখানেও তাঁর পরামর্শ গ্রহণের ব্যাপারে অনিহা পরিলক্ষিত হয়।

১৬১৭ সালের মার্চে বেকন লর্ড কিপার হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আর তা সম্ভব হয়েছিল রাজা প্রথম জেমসের প্রিয়ভাজন জর্জ ভিলিয়ার্সের বিশেষ অনুগ্রহে। পরবর্তী বছরের জানুয়ারিতে বেকন লর্ড চ্যান্সেলরের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু ভিলিয়ার্সের পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হলেন। বেশির ভাগ সময়ে তিনি তাঁর দপ্তরে বিচারকার্য সম্পর্কিত দায়-দায়িত্ব পালন করে সময় কাটাতেন।

চ্যান্সেলর হিসেবে বেকন যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শন করেন এবং স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে ও আর্ল অব সাফোক-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তাঁর আয়-উপার্জন ভালো ছিল এবং তিনি স্বচ্ছল জীবন যাপন করতেন। নিজের ৬০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তিনি ব্যাপক জাঁকজমকের আয়োজন করেন। ন্যাট্যকার বেন জনসন সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন।

বেকন তাঁর পেশাগত অবস্থানের তুঙ্গে আরোহণ করলেন। সম্মান, যশ, অর্থ, জনগণের প্রশংসা—সবই লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর এই খ্যাতি কালিমালিপ্ত হল কতিপয় লজ্জাজনক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। এই কাজগুলো তিনি করেছিলেন রাজা ও ডিউক অব বার্কিংহামের প্ররোচনায়। তিনি তাঁর সময়কার বিখ্যাত মানুষ স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের দণ্ডে সম্মতি দিয়েছিলেন, অভিযুক্ত হয়ে বিচারে সোপর্দ হলে বন্ধু অ্যাটর্নি জেনারেল এলভার্টনের পাশে দাঁড়াননি, স্পেনের সাথে জোট গঠনকল্পে জনমত উপেক্ষা করে সম্মতি দিয়েছিলেন। আর এ সমস্ত কাজের মাধ্যমে তাঁর জনপ্রিয়তায় ধস নামে। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে বিচারকার্য প্রভাবিত করার অভিযোগ ওঠে। এইসব অভিযোগ উত্থাপনে তিনি রাজাকে লেখেন: 'যারা আপনার চ্যান্সেলরকে আঘাত করতে উদ্যত হচ্ছে, আশংকা করি তারা আপনাকেও আঘাত করবে।' কিন্তু রাজা তেমন কিছু করতে পারলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে প্রচুর সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় হল। উপায় না দেখে বেকন ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। ১৬২১ সালে হাউস অব লর্ডসে বিস্তারিত আলাপ-

আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হল: তাঁকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড জরিমানা গুনতে হবে; রাজা যত দিন চাইবেন তত দিন তিনি স্টেট প্রিজনে কারারুদ্ধ থাকবেন; আর কখনো কোনো দায়িত্বশীল পদে আসীন হতে পারবেন না এবং সংসদে বসতে বা আদালতের ত্রিসীমানা ঘেঁষতে পারবেন না। কিন্তু এই শাস্তি পুরোপুরি তাঁকে ভোগ করতে হয়নি। চার দিনের মাথায় তাঁকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়; তাঁর জরিমানা মওকুফ করে আদালতে যাওয়ার নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হয়; কিন্তু সংসদে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল।

পরবর্তী পাঁচ বছর ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে ফলদায়ী সময়। সাহিত্য ও দর্শনের নিরিখে এই সময়টা ছিল সত্যিই মূল্যবান। উচ্চপদে আসীন থেকে তিনি যা করতে না পেরেছেন, এই পাঁচ বছরে পৃথিবীর জন্য রেখে যেতে পেরেছেন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অবিস্মরণীয় এক ভাণ্ডার। প্রবন্ধের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও ইতিহাসভিত্তিক রচনার এক অমূল্য সম্পদ তিনি রেখে গেছেন: History of Henry VII, History of Great Britain, De Augments (Advancement of Learning), New Atlantis (অসমাপ্ত)।

বেকনের দর্শন

বহুবিধ বিষয়ে বেকনের আগ্রহ ছিল– বিজ্ঞান, মানুষের স্বভাব, মনস্তত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাশাস্ত্র। তবে তাঁর মূল আকর্ষণ মানুষের প্রকৃতির বৈচিত্র্যমণ্ডিত দিক সম্পর্কে; মানুষের কর্মকাণ্ডের কোনটি স্বতঃস্ফূর্ত আর কোনটি অজ্ঞতাপ্রসূত সে বিষয়ে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি ছিল।

শরীরচর্চার মাধ্যমে সব রোগের চিকিৎসা করার যে প্রবণতা তৎকালীন চিকিৎসকদের মাঝে ছিল, বেকন তাঁর সমালোচনা করেছেন। তিনি প্রচুর গবেষণা ও অধ্যয়নের মাধ্যমে চিকিৎসার ধারা পাল্টানো ও নিরাময়কল্পে ওষুধ উদ্ভাবনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। মনস্তত্ত্বের নিরিখে বেকন একজন 'আচরণবাদী'। মনুষ্য আচরণের কার্যকারণ ও তার প্রতিক্রিয়া বা ফলাফল বিষয়ে গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা দাবি করেছিলেন এবং বিজ্ঞান শব্দকোষ থেকে 'সুযোগ' (Chance) শব্দটাকে মুছে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি নতুন ধারার বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেছিলেন– যার নাম সামাজিক মনস্তত্ত্ব (Social Psychology); বলেছিলেন, দার্শনিকদের প্রথা, চর্চা, অভ্যাস, শিক্ষা, অনুকরণ, বন্ধুত্ব, প্রশংসা, খ্যাতি, যশ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীরভাবে জ্ঞান অন্বেষণ করা দরকার।

বেকনের মতে, বিজ্ঞানের উপরে কোনো কিছু নেই। সে সময়ই তিনি মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে, যাদুটোনা, ভবিষ্যদ্বাণী, টেলিপ্যাথি, কুসংস্কার ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এসব বুজরকি পরিত্যাজ্য। আবার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকেও তিনি পর্যাপ্ত মনে করেননি দর্শনের শৃঙ্খলা ব্যতিরেকে। বিজ্ঞানের যা প্রয়োজন তা হল দর্শন। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে দার্শনিক জ্ঞান অপরিহার্য। তবে তিনি এও মনে করতেন যে, গ্রিক দার্শনিকেরা তত্ত্বের পেছনেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন, পর্যবেক্ষণের পেছনে নয়। দর্শনে দীর্ঘদিন বন্ধ্যত্ব বিরাজ করেছে, তাকে উর্বর করে তোলা প্রয়োজন। চিন্তা পর্যবেক্ষণে যতটুকু সাহায্য করে প্রকৃতি সম্পর্কে মানুষ তার বেশি কিছু অনুধাবন করতে পারে না। অ্যারিস্টোটলের পর থেকে দর্শন যে আর খুব একটা অগ্রসর হয়নি এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ দুই শত বছর ধরে অ্যারিস্টোটল যা আবিষ্কার করে গেছেন তার কপচানি চলছে। মধ্যযুগের সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে এবং নতুনভাবে শুরু করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হল মনের মাঝে যে 'প্রতিমূর্তি' (Idol) আছে তাকে ধ্বংস করা। এজন্য বেকন মানুষের ত্রুটির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে:

প্রথমত, 'Idols of the Tribe' অর্থাৎ যেসব ত্রুটি স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে, যার ওপর মানুষের খুব একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

দ্বিতীয়ত, 'Idols of the Cave' অর্থাৎ ব্যক্তি মানুষের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ত্রুটি। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের মনে একটি নিজস্ব আখড়া আছে যেখানে মানুষের স্বভাবের স্বাভাবিক রং ও প্রকৃতি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন কেউ কেউ বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতা পোষণ করেন এবং সবকিছুর মাঝে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেন; আবার কেউ কেউ সবকিছুর মাঝে সাদৃশ্য অবলোকন করেন। সুতরাং একদিকে আমাদের আছেন বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পী আর অন্যদিকে কবি ও দার্শনিক।

তৃতীয়ত, 'Idols of the Market Place' অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য বা অন্যের সাথে সম্পর্কের কারণে যে ভ্রান্তি জন্মায়, কথাবার্তা বা বাক্যের অপব্যবহারের কারণে মনের মধ্যে যে খুঁতখুঁতে ভাব জন্ম নেয় তার থেকে দূরত্ব তৈরি হয়। দার্শনিকেরা বলেন, 'first cause uncaused' কিংবা 'first mover unmoved', কিন্তু এগুলো অজ্ঞতা ঢেকে রাখার একটা চাতুরিমাত্র। প্রতিটি সৎ চিন্তার মানুষই জানেন যে, কারণ ছাড়া কোনো কিছুই ঘটে না।

শেষমেশ আসে 'Idol of the Theatre' বা সেই ভ্রান্তি যা বিভিন্ন দার্শনিকের গোঁড়া মতবাদ (dogma) থেকে মানুষের মনে অনুপ্রবেশ করে। দর্শনের সমস্ত গৃহীত পদ্ধতি মঞ্চাভিনয়, দার্শনিকদের দ্বারা সৃষ্ট জগতের উপস্থাপনা, আর তা অত্যন্ত কষ্টকল্পিত। প্লেটোর জগৎ শুধু প্লেটোরই সৃষ্টি আর তা শুধু প্লেটোকেই তুলে ধরে, অন্য কোনো জগৎকে নয়। কোনো ব্যক্তি যদি নিশ্চয়তার সাথে কোনো কিছু শুরু করেন, তাহলে তা সন্দেহে শেষ হতে পারে; কিন্তু সন্দেহ নিয়ে কোনো কিছু শুরু করলে পরিশেষে নিঃসন্দিহান হতে পারেন।

বেকনের প্রবন্ধ: বিষয়বৈচিত্র্য

বেকন তাঁর প্রবন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের প্রতি বিপুল আগ্রহ দেখিয়েছেন। একে তিনি বলেছেন 'Dispersed Meditation'। প্রবন্ধগুলো তিন দফায় প্রকাশিত হয়; প্রথমে ১৫৯৭ সালে, তারপর ১৬১২ এবং শেষ দফায় তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে ১৬২৫ সালে। ব্যক্তি ও সমষ্টিগত আচরণ বা রাষ্ট্রীয় খুঁটিনাটি তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হয়েছে। মানুষের প্রকৃতি নিয়ে লিখিত প্রবন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন বুদ্ধিদীপ্ত আবার তা যথেষ্ট নৈরাশ্যজনকও বটে।

বেকন আদর্শবাদী ও রাজনীতিবিদ। তাঁর অনেক প্রবন্ধেই তিনি মানুষের নৈতিকতা ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে কথা বলেছেন, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান সম্পর্কিত আগ্রহ তেমন প্রকাশিত হয়নি। সাধারণ মানুষের চেয়ে বেকনের নৈতিকতা উঁচু হলেও তা যতখানি চর্চাযোগ্য তার বেশি নয়। পাঠকের কাছে তাঁর আবেদন হল সঠিক কাজটি করো আর সত্য কথা বলো, 'যদি তা খুব বেশি মহার্ঘ না হয়'। তিনি 'যেকোনো মূল্যে' ন্যায়বিচার করার কথা বলেননি'। তিনি চাতুরির নিন্দা করেন বটে কিন্তু তাকে ঘৃণ্য বা অনৈতিক বলেননি। আবার অন্যকে বঞ্চিত না করে স্নেহপরবশ হয়ে কাউকে বিশেষ সুবিধা দেওয়াটাকেও তিনি অনৈতিক মনে করেননি। বেকন অন্যায়কারীদের সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, কারণ তা না হলে তা একসময় তাঁর নিজেরই ক্ষতি করতে পারে। তবে বন্ধুত্বকে তিনি উচ্চমূল্য দিয়েছেন। ধর্ম বিষয়ে বেকনের অতি উৎসাহ ছিল না, ছিল যৌক্তিক ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয় জন্মের প্রাপ্তিযোগের লোভ কিংবা শাস্তির ভীতি তাঁকে কখনোই তাড়িত করেনি।

রাষ্ট্র-রাজনীতি-রাজনীতিক তাঁর প্রিয় বিষয়ের মধ্যে একটি। জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের নীতি কী হওয়া উচিত, বিশেষ করে যুদ্ধ ও সামরিক নীতি— তা নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা ছিল প্রবল। ঔপনিবেশিকতা নিয়েও তিনি তাঁর প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন। কখনো কখনো তা মেকিয়াভেলির দর্শনের সমার্থক ছিল বলে মনে

করা হয়। জোর দিয়ে বলা মুশকিল, বিষয়বস্তু না শৈলী–কোনটি তাঁর লেখনীর উল্লেখযোগ্য দিক; কোনটি কাকে ছাপিয়ে গেছে। রূপকালংকার ব্যবহারের এলিজাবেথীয় বৈশিষ্ট্য যেমন রয়েছে আবার রেনেসাঁর উচ্ছ্বসও দুর্লক্ষ্য নয়। তাঁর লেখনী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন খ্যাতিমান সমালোচক বলেছেন, 'তাঁর রচনা গুরুপাক খাবারের মতো, একবারে বেশি খেয়ে হজম করা মুশকিল।'

এপিকিউরান দর্শনের প্রতি নিজের দুর্বলতা বেকন লুকাননি, বরং অকপটে স্বীকার করেছেন, যা খুবই উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়। স্টয়িকদের আকাঙ্ক্ষা দমন করে রাখার মতো শারীরিক-মানসিক পীড়ন আর আছে বলে তিনি মনে করেন না। এটাকে তিনি অসম্ভব দর্শন বলে মনে করেন, কারণ সহজাত প্রবণতা দীর্ঘদিন চেপে রাখা যায় না। বল বা চাপ প্রয়োগ করলে মানুষের প্রকৃতি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। নৈতিক দর্শনের প্রবন্ধসমূহে খ্রিষ্টনৈতিকতা অপেক্ষা মেকিয়াভেলির নৈতিক দর্শনের প্রতিফলন বেশি লক্ষ করা যায়। একটি প্রবন্ধে ইতালীয় প্রবচনের উদ্ধৃতি তুলে ধরছেন তিনি: এত ভালো যে সে ভালো কোনো কাজের নয়। সততার সাথে কিঞ্চিৎ ভণিতার মিশ্রণ তিনি সমর্থন করেন, যা নরম ধাতুতে শক্ত ধাতু মিশিয়ে তার দীর্ঘস্থায়িত্ব বাড়ানোর শামিল। বেকন কর্মে বিশ্বাসী মানুষ ছিলেন। শুধু চিন্তামগ্নতা আর তত্ত্ব কপচানো তিনি ভীষণ অপছন্দ করতেন। গ্যেটে যেমন মনে করতেন জীবন মানেই কর্ম, ধ্যানমগ্নতা নয়; বেকনও তেমনি মনে করতেন, যে জ্ঞান কর্মে উদ্বুদ্ধ করে না, তা ঘৃণ্য।

বেকন বহুবার নাস্তিক হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছেন, কারণ তাঁর সমস্ত দার্শনিক চিন্তাভাবনা ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভর। কিন্তু 'নাস্তিকতা প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে তিনি বিশ্বাস স্থাপনের আবেদন জানিয়েছেন। 'নাস্তিকতার কারণ ধর্মীয় বিভক্তি', তিনি বলেছেন, এক-আধটা ধর্ম হলে তাদের জানার আকাঙ্ক্ষা জাগে, অজস্র হয়ে গেলে তা নাস্তিকতার জন্ম দেয়। তাঁর মতে, বিপর্যয় ও প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ ধর্মের প্রতি বেশিমাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়ে। আর শান্তি ও সমৃদ্ধির সময় মানুষের ঝোঁক বাড়ে নাস্তিকতার প্রতি।

বেকন তারুণ্যের পূজারি। তরুণরা পরামর্শ করার চেয়ে কর্ম সম্পাদনে বেশি পারদর্শী, যেমন, তাদের আগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা অপেক্ষা নতুন প্রকল্পে। বয়সী লোকেরা বেশিমাত্রায় অভিযোগপ্রবণ, পরামর্শে দীর্ঘ সময় নিয়ে থাকেন, কম ঝুঁকি নেন, দ্রুতই অনুতাপ করেন, আর কদাচিৎ কোনো কাজকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান, আর মধ্যমমানের সাফল্যেই বেশিমাত্রায় আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন।

রাজনীতিতে তিনি রক্ষণশীল সন্দেহ নেই। রাজতন্ত্রকে তিনি শ্রেষ্ঠ সরকারপদ্ধতি মনে করেন। সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি তিনটি জিনিসকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন: প্রস্তুতি, বিতর্ক ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কর্মসম্পাদন। তিনি একজন সমরবাদীও বটে। শিল্পের বিকাশ নিয়ে তিনি খেদ প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রক্রিয়াতেও তাঁর আপত্তি ছিল, কারণ তাতে সৈনিকেরা অলস হয়ে পড়তে পারে। রাষ্ট্রের ভেতরে বিদ্রোহ জেগে ওঠার কারণ হিসেবে তিনি কয়েকটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন: ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রবর্তন, করারোপ, আইন প্রবর্তন, সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া, নিপীড়ন-নির্যাতন, অযোগ্য ও বিতর্কিত ব্যক্তির উত্থান, বিদেশির উপস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনী, উপদলীয় কোন্দল ইত্যাদি। নেতৃত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, নেতার উচিত প্রতিপক্ষের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি এবং নিজের অনুসারীদের মাঝে ঐক্য গড়ে তোলা।

বেকনের প্রবন্ধের বিশেষত্ব নিহিত আছে এর গভীরতা ও প্রকাশভঙ্গির মাঝে। বাস্তব অভিজ্ঞতার এমন সমৃদ্ধ ভাণ্ডার কেউ এমনভাবে এর আগে উন্মোচন করতে পারেননি। তাঁর লেখনীর অজস্র পঙ্‌ক্তি প্রবচনের মর্যাদা লাভ করেছে। তাঁর প্রবন্ধসমূহ সঠিক অর্থেই কালজয়ী।

বেকনের রচনাশৈলী

জ্যাকবীয় যুগের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে বেকনই ছিলেন সেরা। সংক্ষিপ্ত বাক্য, রূপকালংকার (Metaphor), উপমার (Simile) ব্যবহার তাঁর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। প্রবন্ধসাহিত্যে অলংকারবহুল ভাষা ব্যবহারে তাঁর সমকক্ষতা কেউ অর্জন করতে পারেননি। তিনি চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার ও সরস বাক্যের প্রয়োগ এড়িয়ে চলতেন। তবে প্রচুর উদ্ধৃতির ব্যবহার তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তবে সেগুলো অনেক সময় যথাযথ হত না। কিন্তু তাঁর বাক্য বা যুক্তিটি ওজনদার হয়ে উঠত। স্বল্প কথায় অনেক কিছু বলার ক্ষমতা দেখিয়েছেন তিনি। এও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর অনেক প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ। তিনি শুধু বিষয়ের ধারণা দিয়ে গেছেন, ব্যাপক তথ্য তুলে ধরেননি। প্রবন্ধগুলো বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত; যেন এক স্বপ্ন-কল্পনা (Reverie) বা রাতের খাবারের পর কোনো প্রাজ্ঞজনের একক ভাষণ (an after dinner monologue) এবং বিক্ষিপ্ত টোকাটুকি। এর অনানুষ্ঠানিক বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। বিষয় ও যুক্তিসমূহ সুপ্রথিত নয়; বিশৃঙ্খলভাবে একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে, লেখক অনেকটা কথোপকথনের স্বাধীনতা উপভোগ করেন।

বেকনের আগে হুকার ও র‍্যালে ছিলেন বিখ্যাত প্রাবন্ধিক; কিন্তু তাঁদের শৈলী সবাই পছন্দ করেননি। উল্লেখ করার মতো অনেক ত্রুটি ছিল। বাক্যগুলো অসম্ভব বড় আর অস্পষ্টতায় ভরা। এই অস্পষ্টতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বন্ধনীমধ্যস্থ বাক্যাংশ (Parenthesis)-এর ব্যবহার। উপমা-উৎপ্রেক্ষার উৎসগুলো খুবই অপরিচিত। ভীষণ রকমের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। লাতিন ও কালজয়ী বিভিন্ন রচনার উদ্ধৃতিতে ঠাসা। এসব বৈশিষ্ট্য অগ্রাহ্য করে বেকনই প্রথম সরল ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করলেন। তাঁর বাক্যগুলো ছোট ও প্রাঞ্জল। বন্ধনীমধ্যস্থ বাক্যের ব্যবহার তিনি পরিহার করলেন, লাতিন বা অন্যান্য উৎস থেকে উদ্ধৃতি দিলেও তা সরল ও বোধগম্য। ব্যাকরণের কাঠামো মাঝেমধ্যে দুর্বল হয়ে পড়লেও তা কদাচিৎ অস্পষ্ট। সব মিলিয়ে ফ্রান্সিস বেকন প্রবন্ধসাহিত্যের যে ধারা সৃষ্টি করলেন তাকে পাঠকেরা স্বাগত না জানিয়ে পারেনি। এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য। বেকন তাই আজও প্রয়োজনীয় ও বহুল পঠিত।

উপসংহার

প্রবন্ধ ছাড়াও নানাবিধ লেখনীতে বেকন উৎকর্ষ দেখিয়েছেন। New Atlantis-এ তিনি যেমন প্রতীকাশ্রয়ী কাহিনী নির্মাণের প্রয়াস চালিয়েছেন, তেমনি Henry VII একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। আবার The Advance-ment of Learning-এ যে দার্শনিক শৈলীর সাথে পাঠকের পরিচয় ঘটে তা উল্লিখিত রচনা থেকে ভিন্ন। বেকন একে Dispersed Meditation হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য রচনা Novum Organum (১৬২০) দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে লিখিত হলেও তা অতীতের সমালোচনার পাশাপাশি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত। মধ্যযুগের অনেক ভুল ধারণাকে তিনি ভেঙে দিয়েছেন। বিজ্ঞান-গবেষক হিসেবে তাঁর অবদানকে অবহেলা করার সুযোগ নেই। মানব ইতিহাসের প্রথাগত ধারণা ছিল স্থবির ও গতিহীন যাকে বেকন ভেঙে দিয়ে গতিশীলতা নিয়ে এসেছেন। মানুষের পৌরাণিক ধ্যানধারণা পালটে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে। হিমায়নের আধুনিক প্রক্রিয়া নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৬২৬ সালের মার্চে বরফ পচন রোধ করে কি না তা পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজ হাতে একটি মুরগি কেটে বরফে ঢেকে দিতে গিয়ে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বসেন, আর সেই ঠাণ্ডাই তাঁর কাল হল, মাস খানেক পর ৯ এপ্রিল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

Of Marriage and Single Life
[বিয়ে ও কৌমার্যব্রত]

[১৬১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়]

অনুবাদঃ শরীফ আতিক-উজ-জামান

মূল কবিতা

স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা আছে যাঁর তিনি নিয়তির হাতে জিম্মি, কারণ তারা ভালোমন্দ যেকোনো বৃহৎ উদ্যোগের পথেই বড় প্রতিবন্ধক। বস্তুত জনকল্যাণমূলক বৃহৎ কোনো কাজ অবিবাহিত কিংবা নিঃসন্তান ব্যক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়েছে; এঁরা প্রাণের টানে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে জনতার সাথে যুক্ত হয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। আর যাঁদের সন্তানসন্ততি রয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের সতর্ক হওয়ার বিশেষ কারণ রয়েছে, কারণ তাঁরা ভালো করেই জানেন যে, পরবর্তীতে ভবিষ্যতের হাতেই তাঁদের প্রিয় মূল্যবান সম্পদ ছেড়ে যেতে হবে। কেউ কেউ, যাঁরা একাকী জীবন যাপন করেন, নিজেদের সাথে সাথেই তাঁদের ভাবনাচিন্তার কবর রচনা করেন, আর তাই ভবিষ্যৎকে নেহাত অপ্রাসঙ্গিক মনে করেন। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ আছেন যাঁরা স্ত্রী-সন্তানদের খরচের প্রকরণ হিসেবে বিবেচনা করেন। শুধু তাই নয়, কিছু নির্বোধ লোভী ধনী আছেন যাঁরা সন্তান না থাকায় গর্ববোধ করেন, কারণ সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের অধিক ধনবান মনে করতে পারেন। এঁরা হয়ত কাউকে বলতে শুনে থাকবেন, 'অমুক খুব ধনী', প্রত্যুত্তরে কেউ হয়ত বলে থাকবে, 'তাতে কী, ছেলেমেয়ে অনেক, খরচখরচাও তাই বেশি।' ভাবখানা যেন এমন, এতে করে সম্পদ কমে যেতে পারে। কিন্তু বিয়ে না করার অতি সাধারণ কারণ হল মুক্ত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, বিশেষ করে যাঁরা আত্মসুখ অনুসন্ধানী ও বাতিকগ্রস্ত মেজাজমর্জির মানুষ; যেকোনো বন্ধনের ব্যাপারে তাঁরা এতটাই স্পর্শকাতর যে কোমরবন্ধ, মোজাবন্ধনীকেও শৃঙ্খল মনে করেন। অবিবাহিত ব্যক্তি বন্ধু, মনিব ও ভৃত্য হিসেবে শ্রেষ্ঠ হলেও নাগরিক হিসেবে সুবিধার নন; কারণ তাঁরা ভারমুক্ত হওয়ার ফলে প্রায়ই পলায়নপর মানসিকতার হয়ে থাকেন এবং সমগ্র পলাতকই এই শ্রেণীভুক্ত। একাকী জীবন ধর্মযাজকের জন্য ভালো, না হলে পরকল্যাণের চেয়ে আত্মকল্যাণ হত প্রথমে। বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটদের বেলায় বিয়ে করা না করাতে কোনো কিছু যায় আসে না। যদি তাঁরা দুর্নীতিপরায়ণ ও সহজেই প্রভাবিত হন তাহলে স্ত্রী না থাকলেও ভৃত্যের মাধ্যমে পাঁচ গুণ বেশি অন্যায় সাধিত হতে পারে। সৈন্যদের বেলায় দেখেছি, সেনাধ্যক্ষরা তাঁদের প্রাক-লড়াই ভাষণে স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিদের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁদের কর্তব্য-কাজে অনুপ্রাণিত করেন এবং আমার ধারণা, তুর্কি সৈন্যদের মনে বিয়ে সম্পর্কে বিতৃষ্ণা সৃষ্টির ফলে সাধারণ সৈন্যরা আরো বেশি করে নিষ্ঠুর হয়ে উঠত। বস্তুত স্ত্রী ও সন্তানসন্ততিরা মানুষকে অধিক মানবিক হতে শেখায়। অবিবাহিত মানুষ, যদিও তাঁরা মাঝেমধ্যে পরোপকারী হয়ে ওঠেন, কারণ তাঁদের সম্পদ অঢেল, ফুরায় না, কিন্তু তাঁরা বেশিমাত্রায় নিষ্ঠুর ও কঠিনহৃদয়। (উৎপথগামীদের বিচারকার্য পরিচালনাকারী বিচার) করা নিষ্ঠুর), কারণ তাঁদের হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশের তেমন কোনো অবকাশ হয়নি। গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ সার্বক্ষণিক ঐতিহ্য ও প্রথা অনুশীলনের মাধ্যমে প্রেমময় স্বামীতে পরিণত হন; এ কথা ইউলিসিসের বেলায় বলা হয়ে থাকে: 'তিনি অমরত্ব ছেড়ে তাঁর বৃদ্ধা স্ত্রীকে বেছে নিয়েছিলেন।'

সতীসাধ্বী নারীরা সব সময় গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে সতীত্বকে মহান গুণ মনে করে। স্ত্রী যদি স্বামীকে বুদ্ধিমান মনে করে তাহলে তার সতিত্ব ও আনুগত্য উভয়ের মাঝে বন্ধন তৈরি করতে পারে; কিন্তু তার স্বামী হিংসাপরায়ণ হলে সে কখনোই তার প্রতি বিশ্বস্ত ও অনুগত হতে পারে না। পুরুষের জন্য স্ত্রী যৌবনে প্রেমিকা, মাঝবয়সে সঙ্গিনী ও বার্ধক্যে সেবিকা। বিয়ে করার পক্ষে এটা একটা শক্তিশালী যুক্তি। আবার বিয়ে করার সঠিক সময় কোনটি, এ প্রসঙ্গে যিনি বলেছিলেন—যৌবন বিয়ে করার জন্য প্রকৃষ্ট সময় নয়, আবার বেশি বয়স হয়ে গেলেও বিয়ে করা উচিত নয়—তিনি ছিলেন বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের একজন[১]।

---

[১] থেলস অব মিলেটাস (৬৩৬-৫৪৬ BC), দার্শনিক ও গণিতশাস্ত্রবিদ; গ্রিসের সাতজন জ্ঞানী মানুষের একজন।

এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, খারাপ স্বামীদের স্ত্রীরা খুবই ভালো হয়ে থাকে। কারণ যা-ই হোক না কেন, যখন তারা সদয় আচরণ করে, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উচ্চ প্রশংসা করে থাকে; কিংবা নিজের ধৈর্য ধরে থাকার কারণে গর্ব অনুভব করে। কিন্তু বন্ধু-শুভাকাঙ্ক্ষীদের শত নিষেধ সত্ত্বেও নিজ পছন্দে যদি কেউ খারাপ বর বেছে নিয়ে থাকে, তখন দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরতে দেখা যায় না, কারণ স্ত্রীটি তখন আপন ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে।

Of Truth

[সত্য]

[১৬২৫ সালের সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়]

অনুবাদ: শরীফ আতিক-উজ-জামান

মূল কবিতা প্রবন্ধ

সত্য আবার কী? ব্যঙ্গ করে জানতে চাইলেন পাইলেট![১] কিন্তু উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলেন না। নিঃসন্দেহে ঘন ঘন মত পাল্টানোর মাঝে আনন্দ রয়েছে এবং একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসে অনড় থাকাটা একধরনের বন্ধন সমতুল্য, উপরন্তু তা চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা খর্ব করে। যদিও এই ঘরানার দার্শনিকেরা আজ আর বেঁচে নেই, কিন্তু সেই মানসিকতার চিন্তাধারা এখনো বলবৎ আছে। তবে সেই আমলের মতো অতটা অখণ্ডনীয় বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানে মানুষ শুধু পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার করে, কিংবা খুঁজে পাওয়ার পর তার ভাবনার ওপর চেপে বসে বলে মিথ্যার পক্ষ নেয় তা নয়; বরং একধরনের সহজাত ও নষ্ট ভালোবাসাই এর জন্য দায়ী। গ্রিকদের পরবর্তী প্রজন্মের একটি গোষ্ঠী বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছেন এবং কী কারণে সাধারণ মানুষ মিথ্যা এত ভালোবাসে তা নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামিয়েছেন, কারণ তারা তো আনন্দ সৃষ্টি করছেন না, যা সাধারণত কবিরা করে থাকেন; কিংবা এতে কোনো লাভালাভের বিষয়ও জড়িয়ে নেই যা আছে ব্যবসায়ীদের বেলায়; তাহলে শুধু মিথ্যার খাতিরেই তারা মিথ্যা বলে থাকে কি না ঠিক বলতে পারব না; এই সত্যই উলঙ্গ ও প্রকাশ্য দিবালোকের মতো, তবে তাতে মুখোশ, ছদ্মবেশ এবং শোভাযাত্রার অর্ধেকও নজরে পড়ে না, যতটা সুস্পষ্ট ও নান্দনিকরূপে দৃশ্যমান হয় মোমের আলোয়। সম্ভবত সত্যকে মুক্তার মর্যাদা দেওয়া যায়, দিনের আলোতে যাকে চমৎকার দেখায়। কিন্তু তাকে হীরক বা ওইরূপ রত্নবিশেষের মূল্য দেওয়া চলে না, যা নানা বর্ণের আলোতে সুন্দর দেখায়। খানিকটা মিথ্যার রং চাপালে কোনো কিছু আনন্দঘন হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে যে, অসার অভিমত, তোষামোদি, অযথার্থ মূল্যায়ন, খামখেয়ালিপনা ইত্যাদি না হলে কারো মন ভরে না, অনেকেই মনঃক্ষুণ্ন হন, মনে বেদনা ও বিরাগ জন্মে? কোনো এক কট্টর ধর্মযাজক কবিতাকে 'শয়তানের সুরা' বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ তাতে কল্পনার খোরাক থাকলেও মিথ্যার ছায়া থাকে। কিন্তু তা এমন মিথ্যা নয়, যা আমাদের মনের গভীরে প্রবেশ করে স্থায়ী আসন গেড়ে বসে এবং স্থায়ী ক্ষতিসাধন করে, যেমনটা আগে উল্লেখ করেছি। কিন্তু

---

[১] জুডার রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পাইলেট যার সম্মুখে যিশুখ্রিষ্টের বিচারকার্য পরিচালিত এবং প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

এইসব বিষয় শুধু মানুষের বিকৃত বিবেচনা ও প্রশ্রয়ের মাঝে বিদ্যমান, যদিও সত্য, যার মূল্য শুধু সে নিজেই নিরূপণ করতে পারে, অনুসন্ধানকারীই কেবল খুঁজে পান, সত্যে বিশ্বাসী মানুষই এর সৌন্দর্য দর্শন ও উপভোগের সাথে সাথে মানব চরিত্রে সত্যের সর্বোচ্চ স্থান উপলব্ধি করেন। ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্টি ছিল ইন্দ্রিয়ের আলো আর সর্বশেষ সৃষ্টি যুক্তির আলো এবং সৃষ্টির পর থেকে নিজ সত্তার আলোকে মানুষের মনকে উদ্ভাসিত করার কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। প্রথম তিনি আলো ফেললেন জড় বা বিভ্রান্তির ওপর। তারপর আলো ফেললেন মানুষের মুখে; এখনো তিনি তার পছন্দকৃত মানুষদের আপন আলোয় উদ্ভাসিত করে চলেছেন। অন্যদের থেকে নগণ্য এপিকিউরিয়ান যে গোষ্ঠী, যাদের মধ্যমণি ছিলেন কবি লুক্রেটিয়াস, তিনি চমৎকার বলেছিলেন: তীরে দাঁড়িয়ে সাগরে ঢেউয়ের বুকে দুলতে থাকা তরী দেখতে ভালোই লাগে, আরো ভালো লাগে দুর্গের জানালায় দাঁড়িয়ে নিচে সংঘটিত যুদ্ধ ও দুঃসাহসিক বীরত্ব দেখতে, কিন্তু সত্যের সুউচ্চ ভূমিতে (যাকে কোনো পর্বতের চূড়াই ছাপিয়ে যেতে পারে না, এবং যেখানে বাতাস সব সময়ই নির্মল ও প্রশান্ত) দাঁড়িয়ে নিম্নভূমিতে বিভ্রান্তি, বিক্ষিপ্ত চিত্ততা এবং কুয়াশা ও ঝোড়ো তাণ্ডব অবলোকনের সাথে তার কোনো তুলনাই চলে না। সব সময় এই আনন্দের উপলব্ধি আত্মকরুণার সাথে হয়, আত্মশ্লাঘার সাথে নয়। সত্যিই আমাদের মন যদি পরহিতে পরিচালিত, ঈশ্বরে সমর্পিত এবং সত্যস্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত হত তাহলে এই পৃথিবীই স্বর্গে পরিণত হত।

ধর্ম ও দর্শনের জগৎ ছেড়ে যারা সাধারণ মানব জীবনে সত্যনিষ্ঠার চর্চা করেন না তাঁরাও স্বীকার করেন যে, কাজেকর্মে যাঁরা স্বচ্ছতা ও স্পষ্টতা বজায় রাখেন তাঁরা সকলের সম্মান লাভ করেন। আর মিথ্যার মিশ্রণ সোনা ও রুপার মুদ্রায় খাদ মেশানোর মতো, যা ধাতুকে মজবুত করে বটে কিন্তু তা আর খাঁটি থাকে না। ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে চলাটা হল সাপের স্বভাব। সাপ পায়ে ভর দিয়ে চলতে পারে না, চলে পেটে ভর দিয়ে। মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াটা মানুষের জন্য যতটা লজ্জার আর কোনো পাপ এত লজ্জার কারণ নয়। মতাঁ[২] ভারি চমৎকার জবাব দিয়েছিলেন যখন তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, মিথ্যাকে কেন এত বড় লজ্জাজনক ও ঘৃণ্য কাজ বলে মনে করা হয়। তিনি বলেছিলেন, চুলচেরা বিচারে দেখা যাবে যে, ঈশ্বরের উদ্দেশে যে মিথ্যা বলে সে দুঃসাহসী, আর মানুষের উদ্দেশে বললে সে কাপুরুষ, কারণ ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়ে সে অন্যায় করে আর মানুষের কাছে সত্য লুকিয়ে ছোট হয়। অবশ্যই মিথ্যার চাতুরি ও সত্যের স্খলনের জন্য উত্তর-প্রজন্মের মানুষের ওপর ঈশ্বরের চূড়ান্ত বিচার নেমে আসবে; আর ভবিষ্যদ্বাণী তো করাই হয়েছে যে, যখন মর্ত্যে যিশুর পুনরাগমন ঘটবে তখন তিনি বিশ্বাস বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না।

Of Plantation

[উপনিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গে]

[১৬১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়]

অনুবাদ: শরীফ আতিক-উজ-জামান

মূল কবিতা

উপনিবেশ স্থাপন মানুষের সবথেকে প্রাচীন, আদিম ও বীরত্বপূর্ণ কাজের অংশ। পৃথিবী যখন বয়সে তরুণ তখন সে প্রচুর সন্তানের জন্ম দিলেও এখন পৌঢ়ত্বে এসে স্বল্পসংখ্যক সন্তানসন্ততির জন্ম দিচ্ছে। আমি নতুন উপনিবেশকে পূর্বতন সাম্রাজ্যের সন্তানসন্ততি বলে মনে করি। সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপনকে আমি সমর্থন করি যেখানে কাউকে জায়গা দিতে অন্যদের উচ্ছেদ করার প্রয়োজন পড়ে না। এটা বসতি স্থাপন নয়, বরং উন্মূলন। উপনিবেশ স্থাপন বৃক্ষরোপণের মতো; লাভ গুনতে হলে কমপক্ষে বিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়, তারপরই ফলটা পাওয়া যায়। অধিকাংশ উপনিবেশ ধ্বংসের মূল কারণ হল, একেবারে শুরুতেই বেশি বেশি লাভ তুলে নেওয়ার প্রচেষ্টা। এটা সত্য যে, দ্রুত লাভের বিষয়টি অবজ্ঞা করার নয়, তবে তা ওই উপনিবেশের জনসাধারণের মঙ্গল ও ভবিষ্যতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। আজেবাজে, ধূর্ত ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করতে যাওয়া খুবই লজ্জাজনক ও গর্হিত কাজ, আর তাতে উপনিবেশের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে, কারণ তারা দুর্বৃত্ত হয়ে ওঠে, কাজকাম করে না, আলসে হয়ে থাকে, অন্যের অনিষ্ট করে, খাদ্যের অপচয় করে, দ্রুতই ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং নিজের দেশে নেতিবাচক খবর সরবরাহ করে। সাধারণত মালী, কৃষক, শ্রমিক, কামার, ছুতোর, জেলে, ব্যাধের সাথে কিছুসংখ্যক চিকিৎসক, শৈল্যবিদ, পাচক এবং রুটি প্রস্তুতকারক নিয়ে নতুন উপনিবেশ স্থাপন করতে হয়। আর প্রথমেই খুঁজে দেখতে হয় সেখানে কোন পণ্য বেশি উৎপন্ন হয় : বাদাম, আখরোট, আনারস, জলপাই, খেজুর, তাল, চেরিফল বা ওই জাতীয় অন্যান্য ফলফলারি এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। তারপর দেখতে হয় কোন ধরনের ফসল সেখানে দ্রুত ফলে এবং তা এক বছরের মধ্যে; যেমন মূলা, গাজর, শালগম, পিঁয়াজ, ভুট্টা ইত্যাদি। যেহেতু গম, বার্লি ও যব ফলাতে প্রচুর শ্রম দিতে হয়, তাই মটরশুঁটি, শিম ইত্যাদি দিয়ে শুরু করা যেতে পারে, কারণ এগুলোতে স্বল্প পরিশ্রম দরকার পড়ে এবং তা মাংস ও রুটির চাহিদা পূরণ করে থাকে। ধান যেখানে প্রচুর পরিমাণে ফলে সেখানে তা মাংসের বিকল্প হয়ে ওঠে। সর্বোপরি সেখানে শুরুতে ধান-গম ফলার আগে বিস্কুট, যবের ছাতু, ময়দা-আটা ইত্যাদির পর্যাপ্ত মজুদ রাখতে হয়। পশু-পাখিদের বেলায় প্রধানত সেগুলোই সঙ্গে নিতে হয় যেগুলোর রোগবালাই কম হয় এবং সংখ্যায় দ্রুত বাড়ে; যেমন, শূকর, ছাগল, হাঁস-মুরগি, তুর্কি মোরগ, কবুতর ইত্যাদি। নতুন উপনিবেশে অবরুদ্ধ শহরের মতো খাদ্যশস্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে বরাদ্দ দিতে হয়। জমির বেশির ভাগ ফলফলারি ও খাদ্যশস্য ফলানোর কাজে ব্যবহার করতে হবে; উৎপাদিত ফসল জড়ো করে মজুদ করতে হবে; তারপর সঠিক অনুপাতে বিতরণ করতে হবে; তা ছাড়া কিছু কিছু জমি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে চাষাবাদের জন্য। আরো বিবেচনা করতে হবে যে, নতুন উপনিবেশে কোন কোন পণ্য স্বাভাবিকভাবেই জন্মায় যার রপ্তানিলব্ধ আয় দিয়ে উপনিবেশের খরচখরচা চলতে পারে (তবে আগেই বলা হয়েছে যে, তা মূল কাজকে বাদ দিয়ে আগেভাগে করা অনুচিত)। যেমন, ভার্জিনিয়ার তামাক বিক্রি করে ওই উপনিবেশের খরচ চলেছে। কাঠ সাধারণত প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, ফলে সহজেই তা রপ্তানিযোগ্য পণ্য হতে পারে। যদি কোথাও লোহা পাওয়া যায় তাহলে সেখানে লোহার কারখানা স্থাপন করা যেতে পারে। যদি কোথাও একই সাথে লোহা আর কাঠ পাওয়া যায় তাহলে দ্বিগুণ লাভ। পরিবেশ অনুকূল হলে কালো লবণ উৎপাদনের অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায়। সিল্কের কাপড় উৎপাদন করলে তাও রপ্তানি পণ্য হয়ে উঠতে পারে। যেখানে প্রচুর পাইন ও দেবদারু বৃক্ষ জন্মায় সেখানে পিচ ও আলকাতরা উৎপাদিত হতে পারে। মাদক ও আগর কাঠও

হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মাটির নিচে খনিজ সম্পদ খুব বেশি নাও থাকতে পারে, সেই প্রত্যাশায় বেশি খোঁড়াখুঁড়ি না করাই ভালো, তাতে প্রত্যাশায় থাকতে থাকতে মানুষ অলস প্রকৃতির হয়ে যায়।

নতুন উপনিবেশের সরকার একজনের হাতে ন্যস্ত হতে হবে; আর কিছু পরামর্শক তাঁকে সাহায্য করবেন; এবং কিছুটা লাগাম দিয়ে তাঁদের সামরিক বল প্রয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে। সর্বোপরি বর্বর দেশ থেকে লাভ তুলে আনতে হবে বটে, কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁর উপাসনার কথা ভুলে গেলে চলবে না। নতুন উপনিবেশের সরকার মূল দেশের অধিকসংখ্যক উপদেষ্টা ও পরামর্শকের ওপর নির্ভর করবে না; সংখ্যাটা স্বল্প হতে হবে; আর তাঁরা ব্যবসায়ী না হয়ে যেন ভদ্র ও অভিজাত শ্রেণীর মানুষ হন; কারণ ব্যবসায়ীরা শুধু তাৎক্ষণিক লাভালাভের বিষয়টি খোঁজেন। উপনিবেশ শক্তিশালী হয়ে না ওঠা পর্যন্ত পণ্যের ওপর কোনো প্রকার করারোপ করা ঠিক হবে না; পণ্যকে শুধু করমুক্ত রাখলেই চলবে না, যেখানে নিয়ে বিক্রি করলে বেশি মুনাফা হবে সেখানে বহনের স্বাধীনতা থাকতে হবে; শুধু যেখানে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে সেই স্থান ছাড়া।

দলে দলে লোক পাঠিয়ে নতুন উপনিবেশে ভিড় বাড়ানো অনুচিত; বরং তাদের হ্রাসপ্রাপ্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে সেই পরিমাণ লোক আবার পাঠিয়ে দেওয়া উচিত; যদি জনসংখ্যা সঠিক থাকে তাহলে দারিদ্র্যের কারণে অর্থনীতির ওপর কোনো চাপ সৃষ্টি হবে না। দেখা গেছে যে, নদী ও সমুদ্রের ধারে অনুর্বর জলাভূমিতে বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে তা উপনিবেশকে সংকটে ফেলেছে। যদিও পরিবহন সমস্যা ও অন্যান্য অসুবিধা এড়ানোর জন্য ওই সকল স্থান নির্বাচন করা হয়, তথাপি উচিত হবে উঁচুস্থানে প্রকল্প নির্মাণ। তা ছাড়া নতুন উপনিবেশের জন্য শুরুতেই লবণ মজুদ করে রাখাটা সঠিক হবে যাতে করে প্রয়োজনের সময় খাদ্যশস্যের সাথে ব্যবহার করা যায়। যদি বর্বর অধ্যুষিৎ কোনো স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করা হয় তাহলে তাদের যেনতেনভাবে যৎসামান্য দিয়ে খুশি রাখার চেষ্টা করা অনুচিত; বরং সঠিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের সাথে যথাযথ ও অমায়িক ব্যবহার করা উচিত; তাদের বেশি সাহায্য-সহযোগিতা করে তাদের মন জয়ের প্রচেষ্টা না করাই ভালো, তাতে তারা তাদের শত্রুদের আক্রমণ করে বসতে পারে, আর প্রতিরক্ষার জন্য এটা অচল; ভালো হয়, যদি মাঝে মাঝে বর্বরদের কিছু কিছু করে উপনিবেশ স্থাপনকারী দেশে পাঠানো যায়, তাতে তারা ওখানে উন্নত জীবনযাপন প্রণালি সম্পর্কে অবগত হতে পারবে এবং ফিরে এসে তাদের দেশের মানুষকে তা জানাতে পারবে।

এরপর উপনিবেশ শক্তিশালী হয়ে উঠলে মূল ভূখণ্ড থেকে পুরুষদের সাথে নারীদেরও আনা যেতে পারে, যাতে করে সেখানে বংশবৃদ্ধি ঘটতে পারে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে যেন উপনিবেশ বিলুপ্ত হয়ে না যায়। আর একটা নয়া উপনিবেশ যখন উন্নতির মাধ্যমে এগিয়ে যেতে থাকে তখন তাকে ফেলে বা ছেড়ে চলে আসা রীতিমতো পাপের শামিল, কারণ তা অসম্মানজনক হওয়া ছাড়াও কৃপাপ্রার্থী অজস্র মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন ভেঙে দেওয়ার মতো অপরাধ।

Of Great Place

[উচ্চপদ প্রসঙ্গে]

[১৬২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়]

অনুবাদ: শরীফ আতিক-উজ-জামান

মূল কবিতা

· উচ্চপদাসীন ব্যক্তিরা তিন ধরনের দাসত্ব বেছে নেন: রাষ্ট্র বা শাসকের দাসত্ব, খ্যাতির দাসত্ব ও কর্মের দাসত্ব। তাঁদের ব্যক্তিস্বাধীনতা, কর্মের স্বাধীনতা বা সময়ের স্বাধীনতা কোনোটাই থাকে না। ক্ষমতার বিনিময়ে স্বাধীনতা হারানো কিংবা অন্যের ওপর ক্ষমতা ফলানোর জন্য নিজের সকল কর্তৃত্ব হারানো মানুষের এক অদ্ভুত আকাঙ্ক্ষা। উচ্চপদে আসীন হতে প্রচুর শ্রম স্বীকার করতে হয়, আর এই কষ্ট স্বীকারের মধ্য দিয়ে মানুষ আরো বড় কষ্ট লাভ করে থাকে। আর তার জন্য কখনো কখনো নিচু কাজও করতে হয়। অসম্মান সহ্য করেও মানুষ সম্মানের আসনে আসীন হতে চায়। আর আসীন হলেও যেমন টিকে থাকা কঠিন পিছিয়ে গেলেও তা একধরনের পতন, কিংবা গ্রহণ লাগার সাথে তুলনীয়, যা সব সময়ই বেদনার। সিসেরো বলেছেন: 'তুমি যা ছিলে তা যদি আর না থাক, তাহলে বাঁচার আকাঙ্ক্ষাও মরে যায়।' শুধু তাই নয়, উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিরা চাইলেই অবসরে যেতে পারেন না, আবার যখন যাওয়া দরকার তখন যেতে চান না। পদমর্যাদা ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিজীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে। এমনকি বার্ধক্য ও অসুস্থতায়ও তাঁরা উচ্চপদের গৌরব উপভোগ করতে চান নগরের বৃদ্ধ পাহারাদারের মতো, যারা বয়স হওয়ার পরও রাস্তার মোড়ে বসে থাকে এবং পথচারীদের বিরক্তি কুড়ায়। অবশ্য উচ্চমর্যাদাশীল ব্যক্তিদের মানসিক প্রশান্তির জন্য অন্যদের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। কারণ স্বীয় অনুভূতির মাঝে যদি তাঁরা তা অনুসন্ধান করেন, খুঁজে পাবেন না; অন্যেরা তাঁদের সম্পর্কে কী ভাবেন তার সাথে যদি তাঁদের নিজস্ব ভাবনার মিল খুঁজে পান এবং তাঁরা নিজেরা যতখানি পরিতুষ্ট অন্যেরাও ঠিক ততটাই সন্তুষ্ট বুঝতে পারেন, তারা সুখী হন; কিন্তু সম্ভবত তাদের মনে উল্টো ধারণা জন্মে থাকে। কারণ তারা তাঁদের বেদনাটা প্রথমে উপলব্ধি করতে পারলেও ত্রুটিটা ঠিক চিনতে পারেন না, আর নিজেদের কর্মব্যস্ততার মাঝে শারীরিক-মানসিক সুস্থতার দিকে নজর দিতে পারেন না। মৃত্যু তাঁদের ওপর খুব ভারী হয়ে পড়ে যাঁরা অন্যের কাছে সুপরিচিত হলেও নিজের কাছে থাকেন সম্পূর্ণ অচেনা।

উচ্চপদাসীন ব্যক্তির ভালো-মন্দ দুইই করার স্বাধীনতা থাকে। তবে পরেরটা অপরাধ; কারণ অন্যায় না করার ক্ষেত্রে প্রথমত দরকার ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয়ত সেই শক্তির জোরে অন্যায় না করা। কিন্তু মানুষের কল্যাণ করার সামর্থ্য উচ্চপদের প্রকৃত ও আইনসম্মত উদ্দেশ্য। মানবকল্যাণের চিন্তা (যদিও ঈশ্বর তা খুব পছন্দ করেন) সুন্দর স্বপ্নের চেয়ে বড় কিছু নয়, যদি না তাকে বাস্তবায়িত করা যায়; আর তা উচ্চপদের ক্ষমতার আনুকূল্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়; কারণ তা সুবিধা ও কর্তৃত্ব প্রদান করে থাকে। সদগুণ ও সৎকর্ম মানবজীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তার জন্য সচেতনতা আত্মার চিরশান্তির জন্য অপরিহার্য। কারণ যদি একজন মানুষ বিধাতার রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে অংশ নিতে পারে, সে তার বিশ্রামেও অংশ নিতে পারে। বাইবেল বলছে, 'ঈশ্বর তাঁর হস্ত দ্বারা সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলেন যে, সবকিছু সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। অতঃপর তিনি বিশ্রাম নিতে গেলেন।'

নিজপদে পালনকৃত দায়িত্বই আমাদের সামনে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ; আর তা অনুসরণই আরো দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে পারে এবং কিছুকাল পরে আপনার সামনে আপনার কাজেরই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে। তখন নিজেই পরখ করে দেখতে পারবেন আপনি শ্রেষ্ঠ কাজটি করেছেন কি না। একই পদে যারা অতীতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের দৃষ্টান্তও অবহেলা করা ঠিক হবে না। আবার তাদের অভিযুক্ত করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা

চালানোও অনুচিত; সঠিক হল তাদের ত্রুটিগুলো এড়িয়ে চলা। কোনো প্রকার আত্মশ্লাঘা না দেখিয়ে বা পূর্বসূরিদের বদনাম না করেই সংস্কার করা উচিত; উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদের উচিত পূর্বসূরিদের জন্য ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। অতীতের কাজকর্ম ঘেঁটে দেখতে হবে কোথায় ভুলত্রুটি ছিল; কালের শিক্ষাও গ্রহণ করতে হবে। অতীতে কী শ্রেষ্ঠ ছিল এবং পরবর্তী সময়ে কী উপযোগী হয়েছে তা দেখতে হবে। উচ্চপদাসীন ব্যক্তির আচরণ ও কর্মপদ্ধতি নিয়মনীতি ও আদর্শের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। বেশিমাত্রার জেদি ও কর্তৃত্বপরায়ণ হওয়া অনুচিত এবং নিজের কর্মধারা থেকে সরে এলে তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত। পদের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত এবং ক্ষমতার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলা অনুচিত; বরং নিঃশব্দে এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতার অনুশীলন চালিয়ে যাওয়া উচিত অধিকার প্রশ্নে কোনো প্রকার হইচই বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না গিয়ে। পাশাপাশি নিম্নপদে কর্মরত ব্যক্তিদের অধিকারও সমুন্নত রাখতে হবে, এবং মনে রাখতে হবে যে, নিজে সব কাজে ব্যাপৃত না হয়ে প্রধানের ভূমিকায় থেকে কর্ম পরিচালনা করাটা সম্মানের। নিজের কর্ম সম্পাদনে অন্যের সহযোগিতা ও পরামর্শ আহ্বান করা যেতে পারে; যারা তথ্য নিয়ে আসে তাদের অনাহূত মনে করে তাড়িয়ে না দিয়ে তাদের দেয়া তথ্যের প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করা সঙ্গত।

উচ্চপদাসীনদের চারটি ত্রুটি উল্লেখযোগ্য: কালক্ষেপণ, দুর্নীতি, দুর্ব্যবহার ও সুবিধাগ্রহণ। প্রথমটি এড়াতে সাক্ষাতের বিষয়টি সহজ করা দরকার, সময়সূচি ঠিক রাখা উচিত। হাতের কাজ সঠিক সময়ে সেরে ফেলা উচিত এবং এক কাজের জন্য অন্য কাজকে বিলম্বিত করা ঠিক নয়। দুর্নীতির প্রশ্নে নিজের ও নিজের অধস্তনদের হাতকে উৎকোচ গ্রহণে বিরত রাখাই যথেষ্ট নয়, আবেদনকারীদেরও নিরস্ত করতে হবে। চারিত্রিক সততা এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে, সততার প্রচারণা ও উৎকোচের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ঘৃণা প্রকাশ করলে আবেদনকারীরা উৎকোচ সাধতে সাহস পাবে না। এই অন্যায় থেকে দূরে সরে থাকাই যথেষ্ট নয়, বরং অন্যের সন্দেহ থেকেও মুক্ত থাকতে হবে। যার মাঝে ভিন্নতা লক্ষ করা যায় এবং সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াই পরিবর্তন নজরে পড়ে, সে সন্দেহের জন্ম দেয়। তাই সব সময়ই মত বা পথ পাল্টাতে সোজাসুজি তা স্বীকার করা উচিত, পরিবর্তনের কারণ জানানো উচিত যা তাকে বদলাতে উৎসাহিত করেছে আর তা মোটেও গোপন করা উচিত নয়। কোনো ভৃত্য বা অনুসারী যদি খুব কাছের হয় এবং তার ঘনিষ্ঠতার বাহ্যিক কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া না যায় তখন স্বাভাবিকভাবে ধরে নিতে হবে যে, সে-ই দুর্নীতির হাতিয়ার।

দুর্ব্যবহার এড়াতে অকারণ বিরক্তি এড়িয়ে চলতে হবে। কঠোরতা আতঙ্কের জন্ম দেয়; কিন্তু দুর্ব্যবহার জন্ম দেয় ঘৃণার। এমনকি কর্তৃপক্ষের তিরস্কার বিদ্রূপাত্মক নয়, গাম্ভীর্যের সাথে হওয়া উচিত।

আর সুবিধাদানের বিষয়টি উৎকোচ গ্রহণের চেয়ে খারাপ। কারণ ঘুষ আসে মাঝে মাঝে, সব সময় নয়, কিন্তু যদি সুপারিশ বা তুচ্ছ বিবেচনা দ্বারা কেউ চালিত হন তাহলে কখনোই এর বাইরে তিনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। রাজা সলোমন বলেছেন, 'কাউকে খাতির করা ভালো নয়, এই ধরনের মানুষ এক টুকরো রুটির জন্য আইন ভাঙতে পারেন।'

'উচ্চপদ মানুষের প্রকৃত রূপটি চেনায়'– এই প্রাচীন প্রবাদটিও সত্য। এই পদই কারো সম্মানের চাকচিক্য বাড়ায়, আবার কারো মুখোশ উন্মোচন করে। গালবা[১] সম্পর্কে ট্যাসিটাস[২] বলেছিলেন: 'তিনি যদি কখনো সম্রাট না হতেন তাহলেও সবাই তাঁকে সাম্রাজ্য পরিচালনার যোগ্য বলে ঘোষণা করত।' কিন্তু ভেসপাসিয়ান[৩] সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: 'ভেসপাসিয়ান তেমন একজন সম্রাট, ক্ষমতা

---

[১] রোমান সম্রাট।
[২] বিখ্যাত রোমান ইতিহাসবিদ।
[৩] আরেকজন রোমান সম্রাট।

যাকে অধিক যোগ্য করেছিল।' প্রথমজন সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন তাঁর প্রাচুর্যের কারণে, আর দ্বিতীয়জনের বেলায় তাঁর আচরণ ও নৈতিক চরিত্রের কারণে।

উচ্চপদে আসীন হয়ে কেউ যদি নিজের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি যোগ্য ও মহৎ মানুষ। কারণ নীতিবান মানুষেরই সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হওয়া উচিত; প্রকৃতিতে দেখা যায় যে, আপন আপন স্থানে পৌঁছাতে সবাই তীব্রবেগে ধাবিত হয় এবং পৌঁছানোর পর স্থির হয়ে যায়। মানুষও উচ্চপদ লাভের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। কিন্তু পেয়ে যাওয়ার পর স্থির হয়ে যায়। উচ্চপদাসীন হতে হলে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, আর যদি দলাদলি থাকে, তাহলে এক দলকে সাথে নিয়ে এগোতে হয়; কিন্তু পদে বসার পর নিরপেক্ষ আচরণ করতে হয়। পূর্বসূরিদের যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন করতে হয়, তা না হলে যে ঋণ থেকে যাবে তা শোধ হবে এই আসন ছেড়ে যাওয়ার পর। সহকর্মীদের যথাযথ সম্মান দেওয়া উচিত; তারা সাক্ষাৎ প্রার্থী হলে কোনো কারণে দেখা করা সম্ভব না হলে অন্য সময় তাদের অপ্রত্যাশিতভাবে ডেকে বক্তব্য শোনা উচিত। একান্ত ব্যক্তিগত আলাপচারিতা বা আবেদনকারীদের সাথে কথাবার্তায় নিজের পদমর্যাদার উল্লেখ না করাটা যুক্তিসঙ্গত আচরণ। তবে লোকে যেন বলাবলি করে, 'দায়িত্ব পালনের সময় তিনি ভিন্ন এক মানুষ।'

Of Revenge

[প্রতিশোধ]

[১৬১২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়]

অনুবাদ: শরীফ আতিক-উজ-জামান

মূল কবিতা

প্রতিশোধ হল বর্বর প্রতিকারপদ্ধতি। মানুষের স্বভাব বেশি করে প্রতিশোধস্পৃহা দ্বারা চালিত হলে সেখানে অধিকমাত্রায় আইন প্রয়োগ করে তার মূলোৎপাটন করার প্রয়োজন পড়ে। প্রথমত অন্যায় করার অর্থ হল আইনের অবমাননা করা; কিন্তু তার প্রতিকারকল্পে প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থ আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া। বস্তুত প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে একজন মানুষ নিজেকে অপরাধীর কাতারে শামিল করেন; কিন্তু সে অন্যায়কে উপেক্ষা করতে পারলে তিনি মহৎ হয়ে ওঠেন, কারণ ক্ষমা করা রাজার ধর্ম। মনে পড়ছে, রাজা সলোমন বলেছিলেন, 'কারো অপরাধকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা মানুষের জন্য গৌরবের বিষয়।' অতীতে যা ঘটেছে তা অপরিবর্তনীয়, তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়; এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে করবার জন্য জ্ঞানী লোকের অজস্র কাজ রয়েছে, তাই অতীত নিয়ে মাথা ঘামানোর অর্থ নিজেদের বাজে কাজে জড়িয়ে ছোট করা।

অন্যায় করার জন্য লোকে অন্যায় করে না; বিশেষ কোনো লাভালাভের আশায়, সুখচিন্তায়, কিংবা সম্মান বা ওই ধরনের কোনো প্রলোভনের কারণেই মানুষ অন্যায় করে। তাহলে সেই লোকটির ওপর আমি ক্ষিপ্ত হব কেন যে আমার থেকে তার নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখল? আর যদি কু-স্বভাবের কারণে কেউ অন্যায় করে থাকে তাকে মনে করতে হবে কাঁটা বা কাঁটাগুল্মের মতো, যারা শুধু খুঁচিয়ে রক্তাক্ত করতে পারে, কারণ তাদের আর কিছু করার ক্ষমতা নেই। যে অন্যায়ের কোনো আইনি প্রতিকার

নেই, শুধু সেই ক্ষেত্রে কোনোমতে প্রতিশোধ সমর্থন করা যেতে পারে; কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে করে গৃহীত প্রতিশোধের কারণে তাকে আবার আইনের আওতায় পড়তে না হয়। নইলে শত্রু যেখানে সাজা পাবে মাত্র একবার, সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণকারীকে যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে দুইবার—অন্যায়কারীর আঘাত সয়ে আর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আইনি শাস্তি ভোগ করে। কেউ কেউ চায়, প্রতিশোধ নেওয়ার সময় অন্যায়কারী যেন তার পরিচয় জানতে পারে। এটা অধিক মহানুভবতার পরিচয়। কারণ এদের কাছে আঘাত করে আনন্দলাভের ইচ্ছাটা বড় নয়, বরং এরা চায় অপরাধী অনুতপ্ত হোক। কিন্তু নীচ ও কাপুরুষ প্রতিশোধগ্রহণকারী রাতের আঁধারে তার শর নিক্ষেপ করতে ভালোবাসে। ফ্লোরেন্সের ডিউক কসমস কুটিল ও দুরাচারী বন্ধু সম্পর্কে এমন চরম মন্তব্য করেছেন যেন ওগুলো ক্ষমার অযোগ্য: 'জানবে (তিনি বলেছেন) যে, আমাদের স্বীকৃত শত্রুদের ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু একজন ভণ্ড বন্ধুকে ক্ষমা করতে বলা হয়নি।' তবে জ্যাকব বরং ভালো কথা বলেছেন, ঈশ্বরের হাত থেকে কি শুধু ভালো জিনিসই গ্রহণ করবে, তার দেওয়া হলাহল পান করবে না? এ কথা বন্ধুদের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। তবে এটা নিশ্চিত, যে ব্যক্তি প্রতিশোধ নিতে চায়, সে তার ঘা শুকাতে দেয় না, না হলে কবে সে ক্ষত শুকিয়ে নিরাময় হত।

জনতার প্রতিশোধ আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, জুলিয়াস সিজার, পার্টিন্যাক্স[১], তৃতীয় হেনরি[২] কিংবা আরো অনেকের হত্যাকাণ্ড। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রতিশোধের ক্ষেত্রে তা হয় না। শুধু তাই নয়। প্রতিশোধপরায়ণ ব্যক্তি একটি ডাইনির জীবন যাপন করে। ডাইনিরা যেহেতু বজ্জাত, তাদের জীবনের শেষ পরিণতিও চরম দুর্ভাগ্যজনক।

Of Love

[প্রেম]

[১৬১২ সালের সংকলনে প্রথম প্রকাশিত হয়]

অনুবাদ: শরীফ আতিক-উজ-জামান

মূল কবিতা

বাস্তব জীবন অপেক্ষা মঞ্চের কাছেই প্রেমের ঋণ বেশি। কারণ মঞ্চে অভিনীত প্রেম বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মিলনাত্মক, মাঝে মাঝে বিয়োগান্তক; কিন্তু বাস্তব জীবনে প্রেম যথেষ্ট অনিষ্টের কারণ হয়ে থাকে। সেখানে সে অবির্ভূত হয় কখনো মোহিনী নারী, কখনো রুদ্রবেশে। খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, মহান ও গুণী ব্যক্তিদের মাঝে (প্রাচীন ও সাম্প্রতিক কালের, যাদের এখনো স্মরণ করা হয়) কেউ প্রেমের নামে উন্মাদ হন নেই। যার অর্থ, বিশাল ও মহৎ কর্মে ব্যাপৃত মানুষেরা এই দুর্বলতা থেকে যথাসম্ভব নিজেদের দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তবে মার্ক এন্টোনিকে ব্যতিক্রম মানতে হবে যিনি রোমক সাম্রাজ্যের অর্ধেকের অধিপতি ছিলেন, তারপর অ্যাপিয়াস ক্লডিয়াস, যিনি রোমক সাম্রাজ্যের দশ সদস্যবিশিষ্ট শাসন পর্ষদের সদস্য ও আইনপ্রণেতা ছিলেন। দুইজনের মধ্যে প্রথমজন অত্যধিক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অসংযত

---

[১] রোমান সম্রাট, বিদ্রোহী সেনাদের হাতে ২য় শতকে প্রাণ হারিয়েছিলেন।

[২] ফ্রান্সের শাসক, ১৫৮৯ সালে এক চরমপন্থী সন্ন্যাসীর হাতে প্রাণ হারান।

স্বভাবের ছিলেন; কিন্তু দ্বিতীয়জন কঠিন নিয়মনিষ্ঠ ও জ্ঞানী বলে খ্যাত ছিলেন; আর তাই (যদিও কদাচিৎ) ভালোবাসা শুধু উন্মুক্ত হৃদয়ে জায়গা করে নেয় তা নয়, অসতর্ক হলে অনেক সুরক্ষিত হৃদয়েও তার অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে।

'আমরা দুজনই বিশাল এক রঙ্গমঞ্চের জন্য যথেষ্ট'—এটা এপিকিউরিয়াস[১]-এর একটি অর্থহীন মন্তব্য। ভাবখানা এমন যে, ঈশ্বর ও সমস্ত মহৎ বস্তুনিচয়ের প্রতি মনোযোগ প্রদানের জন্য সৃষ্ট যে মানুষ, তার কাজ হল শুধু আপন প্রেমমূর্তির আরতি করা আর নিজেকে পশুর মতো মুখটার না হলেও মহৎ উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত চোখ দুটোকে ভৃত্যে পরিণত করা। প্রেমিকার প্রতি প্রেমিক যে অতিরঞ্জিত স্তুতি বর্ষণ করে এবং আমাদের প্রকৃতি ও প্রকৃত মূল্যবোধকে বিকৃত করে তোলে তা বিস্ময়কর। এ ধরনের ধারাবাহিক অতিশয়োক্তি প্রেম ছাড়া আর কোনো কিছুতেই মানানসই নয়। আর তা শুধু কথার মধ্যেই সীমিত থাকে না, চিন্তার মাঝেও থাকে। এ সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য পাওয়া যায় যে, মানুষ নিজেই নিজের চরম তোষামোদকারী, আর তা সমস্ত তোষামোদকারীর মাঝে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তার মধ্যেও প্রেমিক এগিয়ে। কারণ আত্মগর্বী মানুষও কখনো নিজের সম্পর্কে এতটা অতিরঞ্জিত কল্পনা করে না, যতটা প্রেমিকা সম্পর্কে প্রেমিক করে থাকে। আর তাই একটি চমৎকার কথা প্রচলিত আছে, 'একই সাথে প্রেমিক এবং জ্ঞানী হওয়া অসম্ভব।' আর এই দুর্বলতা শুধু অন্যের কাছে নয়, প্রেমিকার কাছেও ধরা পড়ে, এবং প্রেমিকার কাছে সবচেয়ে বেশি করে ধরা পড়ে যদি না প্রতিদানে তার কাছ থেকে প্রেম আসে। প্রেমের সত্যিকার রীতি হল, প্রেমের প্রতিদান প্রেম অথবা প্রেমিকার নিভৃত ও গোপন ঘৃণা। সেই জন্য মানুষকে বেশি করে সতর্ক হতে হয় যাতে করে প্রেমিকার অনুরাগ হারিয়ে না যায়। এই সম্পর্কে জনৈক কবি চমৎকার মন্তব্য করেছেন, প্যারিস[২] হেলেন[৩]কে পেতে গিয়ে জুনো[৪] ও পালাসের[৫] অনুগ্রহ হারাল। আর যে ব্যক্তি বেশিমাত্রায় প্রেমকে গুরুত্ব দেয় সে যুগপৎ জ্ঞান ও সম্পদ হারায়। দুর্বল মুহূর্তে প্রেমের বেগ বেড়ে যায়; যেমন পরম সৌভাগ্য ও চরম দুর্ভাগ্যের সময়, যদিও দুর্ভাগ্যের সময় প্রেমকাতরতা কম দেখা যায়, তবে উভয়ক্ষেত্রেই প্রেমের আগুন প্রচণ্ড তীব্রতা নিয়ে হাজির হয় আর তার সাথে মনের উত্তাপ যুক্ত হয়; আর তাই প্রমাণিত হয়, প্রেম হল নির্বুদ্ধিতার ফসল। তাঁরাই উত্তম যাঁরা প্রেমকে এড়াতে না পারলেও তাকে সঠিক সীমার মধ্যেই রাখতে সক্ষম হন, এবং জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্ম থেকে একে আলাদা করে রাখতে পারেন; কারণ এটা যদি আর সব কাজকর্মের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাহলে সৌভাগ্য বিপন্ন হয় এবং মানুষকে এমন করে ফেলে যে, সে আর তার কাজকর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে না। কীভাবে বলতে পারব না, কিন্তু যুদ্ধে ব্যাপৃত মানুষরাও প্রেমে লিপ্ত থাকেন। আমার ধারণা, তাদের জন্য এটা পানাসক্তির মতোই ব্যাপার, কারণ বিপদ ভুলে থাকতে গেলে আনন্দে ডুবে থাকতে হয়। মানুষের স্বভাবে অন্যকে ভালোবাসার একটি সহজাত প্রবণতা রয়েছে; আর তা যদি এক-আধজনের পেছনে অপব্যয় করা না হয় তাহলে তা অনেকের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে মানুষকে উদার ও মানবিক করে তোলে, যেমন সাধুসন্তদের বেলায় দেখা যায়।

বিবাহিত জীবনের প্রেম বংশবৃদ্ধিতে সহায়ক, বন্ধুত্বপূর্ণ প্রেম মানুষকে সত্যিকার মানুষরূপে গড়ে তোলে, কিন্তু কামসর্বস্ব প্রেম মানুষকে বিকৃত ও অধঃপতিত করে।

---

১ গ্রিক দার্শনিক (৩৪২-২৭৩ BC): তাঁর মতে আনন্দেই সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাণ নিহিত আছে।
২ ট্রয়ের রাজকুমার, প্রিয়াম ও হেকুবার পুত্র।
৩ গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী জিউস ও লিডার কন্যা।
৪ গ্রিক পুরাণ অনুযায়ী শক্তির দেবী।
৫ জ্ঞানের দেবী।